২২

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হতে মহাসভা পর্যন্ত

১৯৩৯-১৯৫৮

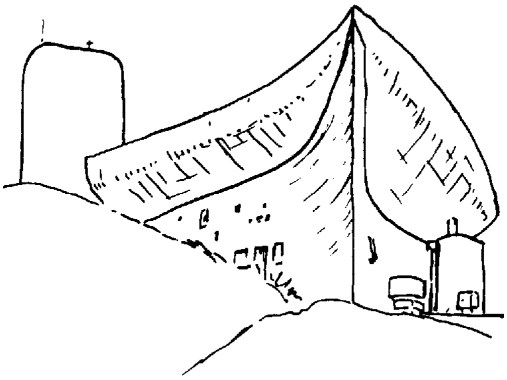

Le Corbusier, Notre-Dame-du-Haut-Ronchamp, 1950-1955.

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লড়াইয়ে জড়িত বিভিন্ন দেশের খ্রীষ্টান ও মণ্ডলীসমূহের উপর সুগভীর এক প্রভাব ফেলেছিল। কোন কোন দেশে খ্রীষ্টানদের আর্থিক ক্ষতি, প্রিয়জনদের হারানো ইত্যাকার কারণে অত্যন্ত কষ্টে পড়তে হয়। তা ছাড়া খ্রীষ্টান বিবেককে বিশেষভাবে যত কঠিন পছন্দ বাছাই করতে হয়। মহাযুদ্ধ উন্নয়ন, চিন্তা-মূল্যায়ন ও বৃদ্ধিলাভের একটা সময়ও ছিল বটে। অনেক আশাই যুদ্ধ পরবর্তী বছরগুলোতে বাস্তব রূপ লাভ করে। ঐশতাত্ত্বিক নবায়ন ও মৌলিক অভিজ্ঞতার এই কালটা পোপ দ্বাদশ পিউস পোপের কার্যকালের শেষ বছরগুলোতে বিভিন্ন সমস্যা ও সংকট প্রত্যক্ষ করে।

॥১ ॥ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে খ্রীষ্টানগণ

১। যুদ্ধের যত অনিষ্ট/ ক্ষতি

খ্রীষ্টানগণ তাদের সহ-নাগরিকদের মতই যুদ্ধের করুণ পরিণতি, যথা – নাৎসী জার্মানীর কবলিত তিন-চতুর্থাংশ ইউরোপের ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ও হত্যার দ্বারা বিপর্যস্ত হন। খ্রীষ্টীয় বিবেকসম্পন্ন মানুষদের যত কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। দখলদার শক্তিগুলোর প্রতি তাদের মনোভাব কি হওয়া উচিত ? যারা তাদের উপর শাসন চাপিয়ে দিয়েছে, তাদের প্রতি কি তাদের অনুগত হওয়া উচিত ? ইহুদীদের নিধনের সামনে তারা কি নির্বিকার থাকতে পারে ? কোন দেশকে মুক্ত করার জন্য সহিংস পন্থা অবলম্বন করা কি নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য ? এসব ব্যাপারে দেশে দেশে, এমন কি একই দেশে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

পূর্বদিকে

পোল্যাণ্ডের পশ্চিমাঞ্চলটি জার্মানী কর্তৃক পুরোপুরি অধিকৃত হয় ও নাম দেওয়া হয় ওয়ারথেগও । জার্মানরা এই অঞ্চলটিকে জার্মানীকরণ করতে চেয়েছিলেন। তারা পোলিশ মণ্ডলীর উপর নির্যাতন শুরু করে যার কোন আইনগত স্বীকৃতি ছিল না। গির্জা ও মঠগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়, সব আন্দোলন নিষিদ্ধ করা হয় এবং যাজকদের বন্দী শিবিরে আবদ্ধ রাখা হয়। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক দখলকৃত পোল্যাণ্ডের অংশ থেকে বহু পোলকে ওয়ারশতে জার্মানদের দ্বারা স্থাপিত সাধারণ সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে বহিষ্কার করা হয়। যেখানে তাদের অবস্থা মোটেও আগের অবস্থা থেকে ভাল হয়নি। ইহুদীরা ওয়ারশ-এর ইহুদী পাড়ায় ঠাসাঠাসি করে থাকে। পোলিশ কাথলিকরা এ ব্যাপারে পোপের নিকট আবেদন জানান। কিন্তু পোপের আশঙ্কা ছিল তিনি যদি এ সম্পর্কে মুখ খোলেন, তবে হয়তো বা এসব হতভাগা দুর্দশাগ্রস্তদের অবস্থা আরও খারাপ হতে পারে। যুদ্ধে পোল্যাণ্ড তার ষাট লক্ষ মানুষ হারায়। যুদ্ধকবলিত আউসভীজ্ শিকারদের মধ্যে একজন অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন ফাঃ ম্যাক্সিমিলিয়ান কল্‌বে (১৮৯৪-১৯৪১) – তিনি পরে সাধু বলে ঘোষিত হন।

রাশিয়ায় জার্মান বাহিনীর অগ্রযাত্রা ধর্মীয় পুনর্জাগরণ ও সেই মণ্ডলীসমূহের জন্ম দেয়, যেগুলো মস্কো থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন বলে ঘোষণা করে। রোমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ইউক্রেনীয় ইউনিয়েট নিজেদের ঢেলে সাজায়। একই সময় জার্মান আক্রমণের মুখে দেশপ্রেম জোরদার করার লক্ষ্যে সোভিয়েত সরকার ঐতিহ্যগত রুশ অনুভূতির উপর নির্ভর করে। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মস্কোতে পুনরায় প্যাট্রিয়ার্ক হন সেরজিয়াস এবং তাঁর পর আসেন আলেক্সিস। যুদ্ধের পর পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে যায় এবং নির্যাতন আবার শুরু হয়।

স্লোভাকিয়া ও ক্রোয়েশিয়া

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে হিটলার বোহেমিয়াকে জার্মানীর সঙ্গে সংযোজন করে চেকোস্লাভাকিয়া রাজ্যের পূর্বাঞ্চল স্লোভাকিয়াকে স্বাধীন মর্যাদা দান করেন। স্লোভাক সরকারের প্রধান ছিলেন একজন ধর্মাধ্যক্ষ মন্সিনিয়র টিসো। তিনি জার্মানীর বিদেশ নীতির সঙ্গে শুধু নয়, সেইসঙ্গে জাতিগত নীতির সঙ্গেও নিজেকে বিরোধী ক'রে তুলেন, ইহুদী নিধনে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য হন। মন্সিনিয়র টিসো একনায়কসুলভ দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে খ্রীষ্টীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে স্থান দেন।

আন্তে পাভেলিচের নেতৃত্বে ক্রোয়াশিয়ার মিথ্যা স্বাধীনতাকে বহু কাথলিকই সার্বিয় অর্থডক্স ধর্মবিশ্বাসের উপর একটা প্রতিশোধরূপেই দেখে। এটা ছিল অর্থডক্সদের বিরুদ্ধে চরম নিষ্ঠুরতার ও একটি নৃশংস গৃহযুদ্ধের অজুহাত মাত্র। জাগরেবের ধর্মপাল মন্সিনিয়র ষ্টেপিনাক একজন ক্রোয়াট হিসাবে তাঁর স্বদেশপ্রেম ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ করার ইচ্ছার মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন।

নরওয়ে, হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম

লুথারান ধর্মপাল এইভিণ্ড বের্গ্রাভ প্রথমে একজন অ-হিংস ও শান্তিবাদী ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে কুইসলিং সরকারকে হাতিয়াররূপে ব্যবহার ক'রে নাৎসীবাদ প্রতিরোধ করার সিদ্ধান্ত নেন, কেননা নাৎসীবাদ জাতীয় মণ্ডলীকে দমন করার চেষ্টা করে। মণ্ডলীর এক সাময়িক নির্দেশনা ইহুদীদের নির্যাতন, বাধ্যতামূলকভাবে যুদ্ধের সমর্থনে শ্রমদান ও সরকারী সংগঠনগুলোতে তরুণদের বাধ্যতামূলক অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে নেদারল্যাণ্ডে ধর্মপালগণ ওলন্দাজ নাৎসী আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে কাথলিকদের নিষেধ করেন। ১৯৪২-৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহুদীদের বলপূর্বক নির্বাসনদানের বিরুদ্ধে কাথলিক ও প্রটেস্টান্টগণ সম্মিলিতভাবে প্রতিবাদ করেন। এর প্রতিশোধ হিসাবে জার্মানরা গ্রেফতারের পরিধি ইহুদী বংশোদ্ভূত খ্রীষ্টানদের পর্যন্ত সম্প্রসারিত করে ঃ এই নির্বিচার গ্রেফতারের শিকারদের মধ্যে ছিলেন একজন কার্মেলাইট ও দার্শনিক, এডিথ স্টেইন । ধর্মপালগণ ওলন্দাজ কর্মকর্তাদের কাছে আবেদন জানান যাতে তারা ইহুদী ও শ্রমিকদের নির্বাসন-প্রেরণে সহযোগিতা না করেন। বেলজিয়ামে কার্ডিনাল ভান রোয়ি বাস্তববাদী হওয়ার চেষ্টা করেন ঃ খুব বেশী সরকারী প্রতিবাদ ছাড়াই যা পুনরুদ্ধার করা যায় তা পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা চালান। তিনি বেলজীয় নাৎসীদের ও সশস্ত্র প্রতিরোধ – দু'য়েরই প্রতিবাদ করতে চেষ্টা করেন। ইহুদীদের নির্বাসন প্রতিরোধ করার জন্য নানা পদক্ষেপ নেন।

ফ্রান্স

অনেকেই ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের পরাজয়কে ফ্রান্সকে জাগতিকীকরণের জন্য দৈব শাস্তি হিসাবেই দেখেন। মার্শাল পিতঁ্য নতুন জুয়ান অব আর্করূপে আবির্ভূত হন। শাসকগোষ্ঠী মণ্ডলীর অনুকূল হন ঃ সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীগণ ও ব্রতধারিণীগণ তাদের ধর্মীয় পোশাক পুনরায় পরিধানের অনুমতি পান; আরাধ্য সংস্কারকে সাধু-সাধ্বীদের পর্ব দিবসের শোভাযাত্রা উপলক্ষ্যে রাস্তায় আনার সুযোগ দেওয়া হয়। লে পু-এর কুমারী মারীয়া, বোলন-এর কুমারী মারীয়ার মহাপ্রত্যাবর্তন ইত্যাদি স্থানগুলোতে ধর্মীয় তীর্থযাত্রার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। স্কুলগুলোকে মঞ্জুরী প্রদান করা হয়। এ সময়কার অধিকাংশ ফরাসী ধর্মপাল ছিলেন সচরাচর ১৯১৪-১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের মহাযুদ্ধের পুরাতন অভিজ্ঞ সৈনিক। তাঁরা ভিচি শাসকগোষ্ঠীর প্রতি প্রসন্ন ছিলেন – এই শাসকগোষ্ঠীকে বৈধ ক্ষমতাসম্পন্ন ও ঈশ্বরের অভিপ্রেত ব'লে স্বীকার করতেন।

অচিরেই জাতি-বিদ্বেষী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, এমনকি অ-দখলকৃত ফ্রান্সেও। ভেল দ হিভ -এর ঘিরে গ্রেফতার ও ফ্রান্স থেকে জার্মানীতে ইহুদীদের পরিকল্পিতভাবে বন্দী শিবিরে নিয়ে যাওয়ার সময় জুলাই ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের আগ পর্যন্ত খ্রীষ্টান কর্তৃপক্ষদের কাছ থেকে কোন প্রকাশ্য বা সরকারী প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি বললেই চলে। ত্যুল্যুস-এর ধর্মপাল মন্সিনিয়র সালিয়েজ ও মন্তাউবান -এর ধর্মপাল মন্সিনিয়র থিয়াস খ্রীষ্টীয় বিবেকের তাড়নায় ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ করেন এভাবে ঃ আর্য-অনার্য সকল মানুষই ভাই ভাই, কারণ তারা সকলেই ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট হয়েছে; জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল মানুষেরই ব্যক্তি মানুষ ও রাষ্ট্র কর্তৃক শ্রদ্ধা-সম্মান পাবার অধিকার রয়েছে। অন্যান্য ধর্মপালগণও – এদের মধ্যে ছিলেন লিয়োন্সের মহাধর্মপাল কার্ডিনাল জের্লিয়ার তাঁদের বিরক্তির কথা জানান, কিন্তু ভিচির প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতার প্রতি তাঁদের আনুগত্যের এবং নীতিবিদ্যা ও রাজনীতির মধ্যে তারা যে পার্থক্য টানেন, তার কারণে অস্বস্তির মধ্যে অবস্থান করেন। জার্মানীতে তরুণদের বাধ্যতামূলকভাবে সৈন্যদলে কাজ করার প্রতি কেমন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হবে – এ নিয়ে ধর্মপাল ও বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়।

মোটামুটিভাবে ধর্মপালগণ প্রতিরোধের পক্ষপাতী ছিলেন না, কারণ তারা সহিংসতা ও ক্ষমতাসীন সরকারের প্রতি দুর্বিনয় অনুমোদন করেননি। কাজেই খ্রীষ্টানগণ নিজ দায়িত্বেই প্রতিরোধ-ব্যবস্থা নিজ স্কন্ধে তুলে নেন ও বিভিন্ন গুপ্ত প্রকাশনার মাধ্যমে তাদের অভিমত প্রকাশ করতে সক্ষম হন। পমিরোল-এর অষ্ট সূত্রে (Bouche du Rhôn, সেপ্টেম্বর ১৯৪১) প্রটেস্টান্টগণ তাদের মনোভাব স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। নভেম্বর ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে অস্তিত্ব লাভ ক'রে
[২৭৪] *Cashier's du Temoignage Chretien* নামক নোটবইগুলো যা খ্রীষ্টীয় প্রতিরোধ সমর্থন করে। এভাবে খ্রীষ্টানগণ তাদের বাছাইকৃত রাজনৈতিক পছন্দের ব্যাপারে তাদের স্বাধীনতা দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেন। তারা তাদের কর্ম-প্রচেষ্টায় সকল দলের সংগ্রামরত ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচিতি লাভ করেন। কাথলিক কর্মোদ্যোগ আন্দোলনের

অনেক সভ্য ও বহু যাজক তাদের প্রাণ বিসর্জন দেন।

জার্মানী

জার্মানীতে হিটলারকে বাধাদান করা যেত নমনীয়ভাবে, কারণ ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠীর বিরোধিতা মানেই জার্মানীর পতন প্রচেষ্টার সামিল ছিল। প্রটেস্ট্যান্টদের দিক থেকে স্বীকারোক্তিকারী মণ্ডলী খুব শিগগিরই জাতি-বিদ্বেষী নীতির বিরোধিতা করে। এর বহু সদস্য-সদস্যাকে বন্দীশিবিরে পাঠানো হয় যেখানে তাদের কয়েকজন মারা যান – এদের একজন হলেন ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুবরণকারী ডিয়েট্রিক বোনহোফার । সর্বাধিক প্রচলিত মনোভাব ছিল পরিহার বা বর্জনের একটা ভীরু মনোভাব। কাথলিক ধর্মপালগণ মাঝে মাঝে ফুলডা সম্মেলনে মিলিত হতেন বটে, কিন্তু নৈতিকতা ও মানবাধিকারের উপর এ সব আক্রমণের বিরুদ্ধে সঠিকভাবে প্রতিরোধ করার ব্যাপারে একমত হতে পারেননি। তারা নিন্দা জ্ঞাপন ক'রে রাষ্ট্রকে সরাসরি দোষারোপ করতে চাননি (দশ আজ্ঞা ভিত্তিক চিঠির সমষ্টি, সেপ্টেম্বর ১৯৪৩)। একটি অন্যতম বিরল সুনির্দিষ্ট বিবৃতি ছিল মুনস্টারের ধর্মপাল ভন গাল্লেন কর্তৃক আগষ্ট ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিবন্ধী ও পীড়িতদের যন্ত্রণাহীন মৃত্যু সংঘটনের পক্ষে রায়দানকারী আইনের বিরুদ্ধে নিন্দাজ্ঞাপন। বার্ণহার্ড লিচেনবার্গসহ কিছুসংখ্যক যাজক ও সংগ্রামী ব্যক্তি (হুয়াইট রোজ গোষ্ঠীসহ) তাদের দুঃসাহসী দৃঢ় অবস্থানের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেন।

[২৭৪] খ্রীষ্টান প্রতিরোধ

লিয়োন্স-এ ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর থেকে Cahiers du Temoignage Chrétien (খ্রীষ্টান প্রতিরোধ বিষয়ক নোটবই) প্রকাশিত হয়। প্রথমটির শিরোনাম ছিল "ফ্রান্স, তোমার আত্মা না হারানোর ব্যাপারে সাবধান হও"। Cahiers ছিল ১৬ থেকে ৬৪ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ পুস্তিকা বিশেষ, যার প্রচারসংখ্যা ছিল প্রতিটি ৩০,০০০ কপি। মে, ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে আরও ছোট আকারে আরও বেশী সংখ্যাবিশিষ্ট পুস্তিকা Courrier Française du Témoignage Chrétien (খ্রীষ্টীয় সাক্ষ্যদানের ফরাসী কুরিয়ার) শিরোনামে প্রকাশিত হয়।

খ্রীষ্টানগণ ও সংযুক্ত প্রতিরোধ ফ্রন্ট

"আমরা অবগত আছি কার্যকরভাবে প্রতিরোধ শক্তিসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চলছে। এসব উদ্যোগ প্রতিরোধের নিমিত্তে সংযুক্ত ফ্রন্টের ব্যাপারে খ্রীষ্টানদের অবস্থান সুনির্দিষ্ট করার আমাদেরকে একটা সুযোগ দান করছে। অবশ্যই বুঝতে পেরেছে এমন খ্রীষ্টানদের কথাই আমরা বলছি।

খ্রীষ্টান হিসাবে কথা বলতে গিয়ে আমাদের বার্তার সীমাতিক্রমতা সম্পর্কে আমরা পূর্ণ সচেতন আছি। খ্রীষ্টের জন্য কোন মানবীয় সংগঠনের মধ্য স্থাপিত হওয়াটা হবে অসহ্য যেমনটা কোন কোন নেতা তার দলকে বৃহত্তর খ্রীষ্টান সংগঠনের মধ্যে নিয়ে আসার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। খ্রীষ্ট সকল দল ও সাময়িক পরিকল্পনার উর্ধ্বে। কিন্তু তাই বলে খ্রীষ্টধর্মের সীমাতিক্রমতার দোহাই দিয়ে যে উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহ জগৎটাকে নাড়িয়ে দিচ্ছে, তাতে জড়িত হওয়া থেকে বিরত থাকাটাও হবে সমভাবে অগ্রহণীয়। খ্রীষ্টধর্ম সীমাতিক্রমী হতে পারে, কিন্তু খ্রীষ্টানরা নয়। ফ্রান্সের খ্রীষ্টানরা ফরাসী। নিরেট ফরাসী এমন সব নৈতিক বাধ্যবাধকতা থেকে তাদের অব্যাহতি দেওয়া তো দূরের কথা, খ্রীষ্টধর্ম বরং এ সমস্ত নৈতিক বাধ্যবাধকতার সঙ্গে সেসব বাধ্যবাধকতাও যোগ করেছে যেগুলো খ্রীষ্টান হওয়ার অবস্থার সঙ্গে বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

সে কারণেই ফ্রান্সের খ্রীষ্টানগণ অন্য সকল ফরাসী নর-নারীর প্রতিরোধ আন্দোলনে তাদের স্থান নিতে পারে। অধিকন্তু, আমরা জানি তাদের অনেকেই তা করেছে। অন্য সকল স্থানের ন্যায় এখানেও তাদের খ্রীষ্টীয় বিবেকের কণ্ঠস্বর সকলকে শোনানো তাদের কর্তব্য এবং যা তাদের খ্রীষ্টীয় বিবেক-বিরুদ্ধ এমন সব ক্রিয়া থেকে বিরত থাকাও তাদের কর্তব্য। আমরা বলছি যে, যখন তারা কোন সংগঠনের সদস্য-সদস্যা ('Temoignage chréteié' সংগঠন বাদে) হন, তারা তখন তা হন ফরাসী নর-নারীরূপে, খ্রীষ্টান হিসাবে নয়। ফ্রান্স যেহেতু এখনও যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে এবং কোন ফরাসীরই সামরিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত বলে বিবেচনা করার অধিকার নেই, তাদের দেশপ্রেমমূলক কর্তব্য পালন করা তাদের পক্ষে স্বাভাবিক।"

Courrier française du Témoignage chrétein 2, জুলাই-আগষ্ট, ১৯৪৩ থেকে উদ্ধৃত।

২। পোপ দ্বাদশ পিউসের নীরবতা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তাঁর শান্তি আবেদনের জন্য পোপ পঞ্চদশ বেনেডিক্ট প্রবলভাবে সমালোচিত হয়েছিলেন। তাঁর তুলনায় পোপ দ্বাদশ পিউস ছিলেন সম্পূর্ণ বিপরীত কেননা ১৯৩৯-১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের যুদ্ধের সময় তাঁর মনোভাবের জন্য তাঁর জীবদ্দশায় পোপ দ্বাদশ পিউস বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে 'প্রতিনিধি' নামে একটি নাটকে – যেটি বিঘ্নকারী ব'লে খ্যাতি লাভ করেছিল – রলফ্ হকহাথ নামে একজন তরুণ জার্মান লেখক নাৎসীদের দ্বারা ইহুদী নির্মূলকরণের বিরুদ্ধে সোচ্চার না হওয়ার অভিযোগে তাঁর সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন তুলেন ঃ পোপ দ্বাদশ পিউসের কি সাহসের অভাব ছিল ? তিনি কি নাৎসীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন ? তিনি কি জানতেন কোথায় কি হচ্ছে ? ব্যাপারটির একটা ভাল দিক ছিল এই যে, উক্ত বিতর্ক মহাফেজখানায় সংরক্ষিত বিভিন্ন দলিলপত্র প্রকাশনায় অনুপ্রাণিত করে, যা কিনা বিতর্কিত বিষয়গুলোর উপর কিছুটা আলোকপাত করে। পোপ হওয়ার আগে পোপ দ্বাদশ পিউস একজন কূটনৈতিক ও পররাষ্ট্র সচিব ছিলেন ব'লে তিনি জার্মান বিষয়াদিতে তথ্যাভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি হিটলারের সঙ্গে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মচুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন এবং ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে Mit brennender Sorge নামক সার্বজনীন পত্রটির খসড়া রচনায় অংশগ্রহণ করেন। নাৎসীদের প্রতি তাঁর কোন সহানুভূতি না থাকলেও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা জারিতে তিনি বিচক্ষণ কূটনৈতিক হস্তক্ষেপ অধিকতর পছন্দ করতেন।

[২৭৫] পোপ দ্বাদশ পিউসের নীরবতা ?

নীচের কয়েকটি পাঠাংশে পোপ দ্বাদশ পিউস জাতিভিত্তিক গণহত্যার কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এগুলো যথেষ্ট সুস্পষ্ট বা সুনির্দিষ্ট ছিল না বলে মনে করা হয়েছে।

বড়দিনের সম্প্রচার, ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৪২

"মানবজাতি এই বাসনার (শান্তি ফিরে আসার) জন্য শত সহস্র মানুষের নিকট ঋণী যারা তাদের পক্ষ থেকে কোন দোষের জন্য নয়, কিন্তু শুধু তাদের জাতিগত উৎপত্তির কারণে মৃত্যুদণ্ডে বা বৃদ্ধিশীল বিলুপ্তির দণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে।"

বার্লিনের ধর্মপাল মঙ্গিনিয়র ভন প্রেসিং -এর নিকট পত্র, ৩০শে এপ্রিল, ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দ

"অধিকতর অনিষ্ট এড়ানোর লক্ষ্যে হস্তক্ষেপ করার কারণ সত্ত্বেও কোথায় ও কতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে বা না হবে তা নির্ধারণ করার ভার আমরা তাদের কর্মক্ষেত্রে পালকদের উপরই ছেড়ে দিচ্ছি। ধর্মপালগণের বক্তব্যগুলি প্রতিশোধ গ্রহণ ও চাপ সৃষ্টির দিকে ঠেলে দেওয়ার ঝুঁকি রয়েছে এবং যুদ্ধের বিস্তৃতি ও মনস্তত্ত্ব থেকে উদ্ভূত অন্যান্য পরিস্থিতির কথাও বিবেচনায় আনতে হবে। আমাদের ঘোষণায় আমরা কেন আত্মসংযত হয়েছি, এটা একটি অন্যতম কারণ।"

পুণ্য ভ্রাতৃসংঘের (কার্ডিনালদের) উদ্দেশে বচন, ২রা জুন, ১৯৪৩

"যারা তাদের জাতীয়তা ও তাদের জাতির কারণে মহা অনর্থপাত দ্বারা, অতি বিষাক্ত ক্ষত সৃষ্টিকারক ও প্রচণ্ড দুঃখ-কষ্টের দ্বারা জর্জরিত হয়ে এবং নিজের কোন দোষ ব্যতিরেকে নির্মূলকরণ পদক্ষেপের হাতে সমর্পিত হয়ে উদ্বেগপূর্ণ সনির্বন্ধ অনুরোধের মনোভাব নিয়ে আমাদের শরণাপন্ন হয়, তাদের আবেদনের প্রতি গভীর ও অনন্যচিত্ত উদ্বেগের সাথে আমার অন্তঃকরণ সাড়া দেয়।

তাদের কষ্ট লাঘব করার উদ্দেশ্যে তাদের নৈতিক ও আইনগত পরিস্থিতি উপশম করার লক্ষ্যে, তাদের অবিচ্ছেদ্য ধর্মীয় অধিকার রক্ষার্থে এবং তাদের দুর্দশা দূর ও তাদের প্রয়োজনসমূহ মেটানোর জন্য আমরা যা যা করার চেষ্টা করেছি, এমন কি তার কিছুটাও আমরা এখানে বর্ণনা করি – এমনটা নিশ্চয়ই আশা করবেন না।

যারা কষ্ট ভোগ করছে, তাদের স্বার্থে এই প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগণের নিকট আমাদের পক্ষ থেকে উদ্দিষ্ট প্রতিটি কথাকে, আমাদের পক্ষ থেকে প্রতিটি প্রকাশ্য উল্লেখকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা ও মূল্যায়ন করতে হবে যাতে তাদের অবস্থাকে আরও অধিক গুরুতর ও অসহনীয় ক'রে তোলা না হয়।"

শান্তির জন্য সনির্বন্ধ আবেদন

১৯৩৯-১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধ ঘোষণা ঠেকাতে চেষ্টা চালানোর পর পোপ দ্বাদশ পিউস মুসোলিনিকে সংঘাত থেকে দূরে থাকতে ও আপোস-মীমাংসার মাধ্যমে তাদের সমস্যাবলী সমাধান করতে ইউরোপীয় শক্তিসমূহকে অনুরোধ করেন। গোটা যুদ্ধ জুড়ে বহু ভাষণ ও বড়দিনের বাণীতে – যদিও অনির্দিষ্টভাবে – তিনি যুদ্ধের অপচয় ও আপোষ মীমাংসার সুবিধা এবং ন্যায্য ভারসাম্যভিত্তিক একটি শান্তির উপর জোর দেওয়া অব্যাহত রাখেন। মন্সিনিয়র মন্তিনির তত্ত্বাবধানে তিনি একটি তথ্য ব্যুরো গঠন করেন যা বন্দী ও নিখোঁজ ব্যক্তিদের সংবাদ সরবরাহ করত। পোপের ইমারত ও কনভেন্টে ইহুদী সন্দেহভাজন ও অন্যান্যরা আশ্রয় লাভ করত। ১৯৪৩-৪৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন যুদ্ধ ইটালিতে এসে পৌছল, তখন দ্বাদশ পিউস মুসোলিনিকে অপসারণ করতে রাজাকে চাপ দিয়ে ও বোমা বর্ষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে রোমকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন। অনেকটা পঞ্চদশ বেনেডিক্টের ন্যায় তিনি তুমুল কোলাহলের ঊর্ধ্বে উঠে নিরপেক্ষ থাকতে চেয়েছিলেন। বেশী না হলেও বলশেভিক মতবাদ কি নাৎসীবাদের মতই বিপজ্জনক ছিল না ?

ইহুদীদের নির্মূলকরণ

যদি বা ইহুদীদের বন্দী শিবিরে নির্বাসন ও নির্মূলকরণ-সংক্রান্ত সংবাদ পুরোপুরি অজানা ছিল না এবং তা ভাটিকানে এসে পৌছত বেশ আগেই, কিন্তু তা ছিল প্রায়ই অস্পষ্ট এবং এর বাতুল গুণাগুণ ইহাকে বিশ্বাস করা শক্ত করে ফেলত। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে পোপ দ্বাদশ পিউস তাঁর অবস্থান সম্পর্কে ঠিকই অবহিত ছিলেন। প্রথমে তিনি তাঁর অসহায়তা উপলব্ধি করেন। তাঁর দু'টি প্রকাশ্য ভাষণে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের তাঁর বড়দিনের সম্প্রচারে ও ২রা জুন, [২৭৫]
১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কার্ডিনালদের উদ্দেশে এক ভাষণে তিনি গণহত্যার কথা উল্লেখ করেন। তবে তাঁর উক্ত উল্লেখগুলো সুনির্দিষ্ট ছিল না। এতে ইহুদী বা জার্মান কারও নাম উল্লেখ করা হয়নি। দ্বাদশ পিউস তাঁর এই আশঙ্কার কথাই ব্যক্ত করেন যে, তাঁর হস্তক্ষেপ তিনি যাদের রক্ষা করতে চান, তাদের উপরই পুনরায় ফিরে আসতে পারে। পক্ষান্তরে, তিনি ধর্মপালদের হাতেই তাঁদের কাজের বিচারের ভার ছেড়ে দেন। বাস্তবিক পক্ষে এর ফল দ্ব্যর্থবোধক ব'লে প্রমাণিত হয়। কোন কোন প্রতিবাদ জার্মান নির্যাতন শুধু বৃদ্ধিই করে। পক্ষান্তরে কূটনৈতিক হস্তক্ষেপ স্লোভাকিয়া, ক্রোয়েশিয়া ও হাঙ্গেরীতে প্রভাব ফেলে। কিছুকালের জন্য ইহুদীদের নির্বাসন প্রদান বন্ধ হয়। ইটালীতে পোপ মহোদয় ১৬ই অক্টোবর, ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ইহুদীদের গ্রেফতারের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেন, কিন্তু তাঁর বিচক্ষণ হস্তক্ষেপ এরূপ নতুন কোন ঘটনা বন্ধ করেছিল।

সুতরাং পোপ মহোদয় কূটনীতিভিত্তিক একটি নীতি অনুসরণ ক'রে যতটা সম্ভব কম বক্তব্য দেন। পরবর্তীতে অনেক পোলই একটা অধিকতর প্রাবক্তিক মনোভাব প্রত্যাশা করেন। পোপের একটা ন্যায়পীঠ থাকা দরকার ছিল। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে মিউনিকে কার্ডিনাল ডোফ্নার বলেন ঃ "ইতিহাসের অতীত পর্যালোচনামূলক বিচারের এ কথাটা বলার পূর্ণ অধিকার রয়েছে যে, দ্বাদশ পিউস একটা জোরালো প্রতিবাদ করতে পারতেন। এটা যদি হত, তাহলে তাঁর উদ্দেশ্যের পূর্ণ আন্তরিকতা বা তাঁর সুগভীর যুক্তির যথার্থতা নিয়ে সন্দেহ করার কারও কোন অধিকার থাকত না।"

॥২ ॥যুদ্ধোত্তর কালে রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ধর্মীয় প্রতিক্রিয়া

১। খ্রীষ্টানদের জন্য এক নতুন পরিস্থিতি

সীমানা স্থানান্তর

মহাযুদ্ধের ফলে পূর্ব ও মধ্য ইউরোপের দেশগুলো, যথা – সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোল্যাণ্ড, যুগোস্লাভিয়ার বিপুল ক্ষতি হয়। পোল্যাণ্ড তার জনসমষ্টির এক-তৃতীয়াংশ হারায়, এর অনেকেই ছিল সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণী (কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলী, যাজক) যাদেরকে সু-পরিকল্পিতভাবে রুশ ও জার্মানরা নির্মূল করে। ফেব্রুয়ারী ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বাক্ষরিত ইয়াল্টা চুক্তি বিভিন্ন মিত্রশক্তির আঞ্চলিক সীমানা নতুন ক'রে নির্ধারণ ক'রে দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন বাল্টিক দেশগুলো (লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া, এস্তোনিয়া), ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের পোল্যাণ্ডের খানিকটা ও রোমানিয়ার কিছুটা নিজের সঙ্গে সংযুক্ত ক'রে পূর্ব দিকে প্রসারিত হয়। পোল্যাণ্ডও অনুরূপভাবে জার্মানীর কাছ থেকে ভূমি উদ্ধার ক'রে পশ্চিম দিকে সরে আসে। জার্মানীকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয় ঃ এক অঞ্চল যায় সোভিয়েতদের অধীনে এবং অন্য অঞ্চল যায় পাশ্চাত্যের অধীনে। সীমান্ত পরিবর্তনের ফলে বিপুল সংখ্যক জনসমষ্টির, বিশেষ ক'রে জার্মান ও পোলদের স্থানচ্যুতি হয়। ধর্মীয় ফলাফল ছিল গুরুত্বপূর্ণ। বহু খ্রীষ্টানই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সোভিয়েতের নির্যাতন কবলিত হয়। জার্মানীতে বিভিন্ন খ্রীষ্টান সম্প্রদায় প্রায়শঃ প্রবাসী-অবস্থার মধ্যে ছিল। তখন থেকে কাথলিকরা বাস করত সেই সমস্ত এলাকায় যেখানে চিরাচরিতভাবে প্রটেস্টান্টদের বাস ছিল এবং প্রটেস্টান্টরা বাস করে চিরাচরিতভাবে কাথলিক-প্রধান এলাকাসমূহে।

পশ্চিম ইউরোপে রাজনীতিতে খ্রীষ্টানগণ

পশ্চিম ইউরোপে খ্রীষ্টানগণ রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রতিরোধ সংগ্রামের সময় ন্যায্যতর সমাজের আশা জন্মলাভ করে। কোন কোন দেশে কমুন্যিষ্ট ও সমাজতন্ত্রীদের বিপরীতে খ্রীষ্টানগণ একটি তৃতীয় শক্তি গড়ে তোলেন। এটাই ছিল ইটালী, জার্মানী ও বেলজিয়ামে খ্রীষ্টীয় গণতন্ত্রের ও এর সমার্থক শাসন-ব্যবস্থার স্বর্ণযুগ। ফ্রান্সে অগ্রাধিকারটা ছিল একটা অ-সাম্প্রদায়িক দলের পক্ষে। কাথলিকরা ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে আসে যার মধ্যে জাগতিকীকরণ তাদেরকে আলোচ্য শতাব্দীর শুরু থেকে আবদ্ধ রেখেছিল। ফ্রান্সে খ্রীষ্টীয় গণতন্ত্রের এই সাফল্য জার্মান দখলদারবাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতার দ্বারা আপোষকৃত পুরাতন রক্ষণশীল ডানপন্থীদের পতন সূচিত করে।

এই সমস্ত খ্রীষ্টান গণতান্ত্রিক দলগুলো সাবেক অনিচ্ছুক কাথলিকদের গণতন্ত্র ও সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থা গ্রহণ করাতে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। একই সময় তারা কয়েকটি সামাজিক ও ইউরোপীয় আইন-ভাবনার বাস্তব রূপদান করতে সফলকাম হয়। এক সময় পোপ ও ধর্মপালগণ কর্তৃক দূর থেকে নিয়ন্ত্রিত ভাটিকানের আধিপত্যশীল ইউরোপ নিয়ে কথা হয়। আসলে ব্যাপারটা ঠিক তা ছিল না। ধর্মপালগণের তত্ত্বাবধানের বাইরে থেকে এ সকল দল অধিকাংশ ক্ষেত্রে গড়ে উঠেছিল প্রতিরোধ আন্দোলনের সময়। তবে ক্রমান্বয়ে কম্যুনিজম-ভীতি ধর্মপালদের ও পোপকে খ্রীষ্টীয় গণতন্ত্রের পক্ষে কাথলিকদের ভোটদানের পরামর্শ দিতে উদ্বুদ্ধ করে। ফ্রান্সে স্কুল-সংক্রান্ত প্রশ্নটি কাথলিকদেরকে গণপ্রজাতন্ত্রী আন্দোলনের দিকে ঠেলে দেয়, যা দ্রুত একটা সংস্কারিত ডানপন্থী মতবাদের পক্ষে সরে আসে। বামপন্থী খ্রীষ্টানদের একটি অতি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু অংশ সমস্ত সাম্প্রদায়িক দলগুলোর বিষয়ে আপত্তি উথাপন করে।

২। শীতল যুদ্ধের ফলাফল

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের বিজয় পরবর্তী দু'বছরের মধ্যে পুরাতন মিত্রশক্তিগুলোর নিজেদের মধ্যে মতভেদ শুরু হয়। সোভিয়েত রাশিয়া তার নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলে কর্তৃত্ব করার অভিপ্রায় প্রকাশ করে। কয়েক বছরের মধ্যে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে সংখ্যালঘু কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলোও সাধারণ ধর্মঘটের আশ্রয় নিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতায় নিজেদের বহাল করতে সচেষ্ট হয়। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে গোটা চীন মাও সে তুং-এর নেতৃত্বাধীন কম্যুনিষ্টদের করতলগত হয়। এর পরবর্তী বছরগুলোতে কম্যুনিষ্টরা ভিয়েতনামে (১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ও এরপর ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে) ও কিউবায় (১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে) ক্ষমতা দখল করার ফলে ১৩০ কোটি মানুষ অধ্যুষিত একটি কম্যুনিষ্ট বলয় সৃষ্টি হয় এবং বাকী বিশ্ব এর সম্প্রসারণশীল অভিযানে ভীত হয়ে পড়ে।

দুই ইউরোপকে বিচ্ছিন্নকারী লৌহ যবনিকার অন্তরালে খ্রীষ্টানদের উপর নির্যাতনের প্রাদুর্ভাব ঘটে। দেশভেদে নির্যাতনের ধরন ও প্রাবল্য একেক রকম হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নে ধর্মের বিরুদ্ধে লড়াইটা বিশেষভাবে প্রবল আকার ধারণ করেছিল বাল্টিক দেশগুলোতে। লিথুয়ানিয়ায় যাজকগণ সোভিয়েত আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ অব্যাহত রাখেন, যা কিনা ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সচল ছিল। এর পরিণতিতে যাজক সম্প্রদায়ের একটা বৃহৎ অংশকে নির্মূল করা হয়। কারারুদ্ধ কার্ডিনাল স্লিপি নেতৃত্বাধীনে ইউক্রেনের ইউনিয়েট খ্রীষ্টানগণও মারাত্মক রকমের নির্যাতিত হন। রুশ মণ্ডলীর কর্মকর্তাদের বাহ্যিক বশ্যতা স্বীকার সত্ত্বেও অর্থডক্সরাও নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পায়নি।

সকল পূর্বাঞ্চলের দেশগুলোতে রাষ্ট্র কাথলিক কর্তৃপক্ষদের বাধা দান করে কেননা তারা বিদেশের সঙ্গে টাকার লেন-দেন, শত্রুর সঙ্গে আপোস করার দায়ে অভিযুক্ত হন, ইত্যাদি। এ ব্যাপারে হাঙ্গেরীতে কার্ডিনাল মিণ্ডস্‌জেন্তি (১৯৪৯), চেকোস্লাভাকিয়ায় মন্সিনিয়র বেরান, যুগোস্লাভিয়ায় মন্সিনিয়র স্টেপিনাক এবং পোল্যাণ্ডে কার্ডিনাল উইজেন্সস্কির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে বি-স্ট্যানলিনীকরণ পোল্যাণ্ডের ন্যায় (কার্ডিনাল উইজেন্সস্কির মুক্তিদান) কোন কোন দেশে খ্রীষ্টানদের দুর্দশার উন্নতি হয় বটে, কিন্তু অন্যান্য দেশে যেমন – হাঙ্গেরীতে অবস্থার অবনতি হয় যেখানে কার্ডিনাল মিন্তস্‌জেন্তি বুদাপেষ্টে যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক বাসস্থানে পনের বছর ধরে কারারুদ্ধ ছিলেন।

পশ্চিমা দেশগুলো যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো (উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থা, ১৯৪৯)-কে ঘিরে অপর একটি বলয় গড়ে তোলে। এ সকল দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলোকে লৌহ যবনিকার অন্তরালে যা চলত, তারই অনুচর হিসাবে বিবেচনা করা হত এবং তাই তাদের অবিশ্বাসও করা হত। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের পোপ মহোদয়ের এক অনুশাসন পত্রে কাথলিকদের কোনভাবেই কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে নিষেধ করা হয়। কিন্তু কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলো যারা এক ন্যায্যতর সমাজের স্বপ্ন দেখত সেই দরিদ্র শ্রেণীর মানুষদের আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল। এতে কিছু সংখ্যক খ্রীষ্টান যারা ছিল সে সময়কার সামাজিক সমস্যাগুলো নিয়ে চিন্তিত ও ব্যস্ত, তাদের জন্য বিবেকজনিত সংকটের উদ্ভব হয়।

৩। ঔপনিবেশিকতা মোচন ও নবীন মণ্ডলীসমূহ

যুদ্ধের পরবর্তী কুড়ি বছরে ইউরোপীয় শক্তিগুলো চার-পাঁচ শতাব্দী ধরে, বিশেষভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে সকল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল, সেগুলো ভেঙ্গে যায়। উপনিবেশিত জনগোষ্ঠী তাদের স্বাধীনতা লাভ করে। ইউরোপ থেকে আনীত খ্রীষ্টধর্ম উপনিবেশিকদের ধর্ম হয়ে উঠে। দেশে দেশে জাতীয়তাবাদ সুপ্রাচীন কৃষ্টিগুলোর প্রতি এবং এক সময়কার আদর্শায়িত অতীতের প্রতি সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষণ ফিরিয়ে আনে, যেগুলো উপনিবেশন ও খ্রীষ্টধর্ম ক্ষুব্ধ করেছিল। দেশের জনগণের নিজেদের ব্যাপার নিজেদেরই দেখার অধিকারের ধারণাটি কি স্বয়ং উপনিবেশিকদের কাছ থেকে আসেনি ? অবশেষে রাষ্ট্রগুলো সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে সমর্থন লাভ করে এবং তাদের কেউ কেউ মার্কস্‌বাদ দ্বারা অনুপ্রেরিত হয়। শ্রেণীসংগ্রামটি বিদেশী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় আধিপত্য কবলিত স্থানীয় জনগণের সংগ্রামে পরিণত হয়। এখানেই হয়তো ব্যাখ্যা মিলে কেননা স্বাধীনতার জন্য যে

সকল দেশে সংগ্রাম চলে, সেখানকার খ্রীষ্টানদের বিরোধিতা করা হয়েছিল।

১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে কম্যুনিষ্ট চীন খ্রীষ্টানদের জন্য এটা আবশ্যক করে তোলে যেন তারা একটা ত্রিধা স্বশাসন অর্জনের মাধ্যমে বিদেশী প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত করে, যথা – শাসন/পরিচালনার ব্যাপারে (ভাটিকানের সঙ্গে কোন সংযোগ না রেখে); প্রশাসন ও অর্থের ব্যাপারে (কোন বিদেশী আর্থিক সমর্থন থাকবে না)। প্রচারের
[২৭৬] ক্ষেত্রে কোন বিদেশী প্রেরণকর্মী থাকবে না। অতি দ্রুততার সঙ্গে সকল বিদেশী প্রেরণকর্মীদের বহিষ্কার করা হয় ও যে সকল ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ রোমের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা অব্যাহত রাখেন, তাদের হয় কারারুদ্ধ করা হয় নতুবা প্রাণদণ্ড
[২৭৭] দেওয়া হয়। রোমের সঙ্গে সংযোগবিহীন একটি দেশীয় মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৬৬-১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দের সাংস্কৃতিক

কম্যুনিষ্ট চীনে খ্রীষ্টমণ্ডলী

রোম থেকে চীনা কাথলিকদের বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে চীন কম্যুনিষ্ট পার্টি পাশ্চাত্যের বিপরীতে ত্রিধা স্বশাসনের জন্য (শাসন, অর্থ, কর্মীগণ) একটি অভিযান শুরু করে। যারা এটা মেনে নেয়নি, তারা হয় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত হয় অথবা বহিষ্কৃত হয়। সেই সঙ্গে কম্যুনিষ্ট পার্টি চাপ দেয় বা বাধ্য করে যাতে তারা নানা দেশপ্রেমিক সংস্থা গড়ে তোলে, যেগুলো তাদের নিজের ধর্মপালদের নিযুক্ত করে।

[২৭৬] সাক্ষ্যমরের পছন্দ

"কম্যুনিস্ট সেনাদল ২৪শে মে, ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে সাংহাই-এ প্রবেশ করে। বিচক্ষণ হলেও ঝিকাওয়েই-এর সাধু ইগ্নেসিয়াস কলেজের প্রধান ফাঃ বীড স্যাং বিপদের মোকাবিলা করতে ভয় পেতেন না যখন তাঁর দায়িত্বাধীনে ন্যস্ত যুবকদের রক্ষার্থে তা প্রয়োজন হত। শিক্ষা দপ্তর কর্তৃক ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে আয়োজিত পূর্বচীনের প্রাইভেট স্কুলগুলোর একটি সম্মেলনে তাঁকে অংশগ্রহণ করতে হয়। অধিবেশন শেষে সম্মেলনের সদস্যদের তাদের কাথলিক ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ত্রিধা স্বাধীনতা আন্দোলন জোরদার করার কাজে নিজেদের আত্মনিয়োগ করার একটি যুক্ত ঘোষণাপত্র অনুমোদন করতে বলা হয়। ফাঃ স্যাং তাঁর অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের জন্য উঠে দাঁড়ান এবং তাঁর দেখাদেখি অপর চারজনও তা-ই করল। তিনি সুস্পষ্টভাবে কাথলিক শিক্ষার কয়েকটি মূল বিষয় তুলে ধরেন এবং এ ব্যাপারে সরকারের সহানুভূতির জন্য আবেদন জানান। খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের মধ্যে দেশপ্রেমের স্বাভাবিক ভিত্তিটা প্রদর্শন ক'রে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।... প্রতিনিধিগণ তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং এরপর অস্বস্তির সঙ্গে ক্ষান্ত হন। শেষ পর্যন্ত উক্ত প্রস্তাব তুলে নিতে হয়।

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই আগষ্ট তারিখের দুপুর ১টার দিকে পুলিশ তাঁর খোঁজে এল; তারা তাঁর সঙ্গে 'আলাপ' করতে চাইল। কারাগারে মনে হয় ফাদারকে সাংহাই-এর বিচ্ছিন্নবাদী মণ্ডলীর প্রধান হতে প্রস্তাব করা হয়। তিনি তা অস্বীকার করলে তারা তাঁর মনোবল ভেঙ্গে দিতে চেষ্টা করে যাতে তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে ব্যবহার করা যায়। এরপর চলে দীর্ঘ রাত্রি ধরে জিজ্ঞাসাবাদের পালা যার সঙ্গে অনিদ্রা ও মানসিক চাপ তাঁর সর্বশেষ প্রতিরোধ ক্ষমতা নিঃশেষ ক'রে ফেলে। কারাবন্দীরা ফাঃ স্যাং-কে শুধু এই কথা বলতে শুনতে পায়ঃ 'যীশু, মারীয়া, যোসেফ, আমাকে রক্ষা কর।'

প্রহরীরা আরও অত্যাচার করলে ফাঃ স্যাং সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। আসামীকে হাতের মুঠোয় রাখবার প্রচেষ্টাস্বরূপ তারা তাঁকে ৩০শে অক্টোবর তারিখে কারাগারের হাসপাতালে স্থানান্তর করে। ১১ই নভেম্বর, ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে সকাল আট ঘটিকায় ফাঃ স্যাং তাদের কবল থেকে চিরদিনের মত পালিয়ে যান।"

জ্যাঁ মন্সতার্লেঁৎ। Les martyrs de Chine parlent, 1953

[২৭৭] একজন দেশপ্রেমিক ধর্মপাল

১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে চেনটুর ধর্মপ্রদেশীয় সভা লি সী ইং -কে 'সাধারণ ক্ষমতাবিশিষ্ট চেনটুর ধর্মপাল' নির্বাচন করে। নব নির্বাচিত ধর্মপাল বাইবেলের উপর হাত রেখে শপথ গ্রহণ করেন। যা তখনও রক্ষা করা যেত তা নিঃসন্দেহে রক্ষা করতে ইচ্ছুক কিছু সংখ্যক কাথলিকের পছন্দের উপর চটজলদি রায় না দেবার ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

"যেহেতু জনগণের কণ্ঠস্বরই ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর, তাই আমার নিজেকে সংহত ক'রে ধর্মপ্রদেশের দায়িত্ব নিতে হবে। আজ থেকে আমি কম্যুনিষ্ট পার্টির পরিচালনাধীনে সমাজতন্ত্রের পথে চালনা করতে, ভাটিকানের পক্ষ থেকে সকল হস্তক্ষেপ ও অনধিকারচর্চার বিরোধিতা করতে ও ধর্মীয় ব্যাপারে তাদেরকে পুরোপুরি স্বাধীন করে তুলতে ধর্মপ্রদেশের যাজকদের ও চল্লিশ হাজার বিশ্বাসীভক্তকে প্রশিক্ষণ দিতে চাই। কোন্ ধর্মমত বিশ্বাস করতে হবে আর কোন্ নিয়মাবলীই বা পালন করতে হবে, সে ব্যাপারে আমরা ভাটিকানের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা ক'রে চলব, কিন্তু কোনমতেই যেন এতে আমাদের দেশের মর্যাদা বা চীনা জনগণের স্বার্থ ক্ষুণ্ন না হয়।"

বিপ্লবের সঙ্গে ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তুঙ্গে পৌঁছে, কিন্তু তারপর থেকে তা কিছুটা প্রশমিত হয়।

উপনিবেশিত দেশগুলো স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে তারা "তৃতীয় বিশ্ব" গঠনের লক্ষ্যে সহায়তা করে। ক্রমান্বয়ে তৃতীয় বিশ্ব তার শক্তি সম্পর্কে সচেতন হয় এবং পাশ্চাত্যকে, বিশেষ করে খ্রীষ্টানদেরকে এর দারিদ্র্যের জন্য দোষারোপ করা শুরু করে।

নবীন মণ্ডলীসমূহের উন্নয়ন

মণ্ডলীর নেতৃবৃন্দ সচরাচর মঙ্গলবাণী প্রচার ও উপনিবেশনের মধ্যে পার্থক্য করার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের বড়দিনের বার্তায় পোপ দ্বাদশ পিউস জোর দিয়ে বলেন যে, খ্রীষ্টমণ্ডলী জাতীয়তাবাদের উর্ধ্বে অবস্থিত, এটা ইউরোপের সঙ্গে সংযুক্ত কোন সাম্রাজ্য নয়। পোপ কম্যুনিজমের বিষয়ে তাঁর আশঙ্কা ব্যক্ত করেন, কেননা কম্যুনিজম অন্যায়ভাবে মণ্ডলীকে উপনিবেশবাদের অভিযোগে অভিযুক্ত করছিল। অনেকবারই উপনিবেশিত দেশগুলোর ধর্মপালগণ স্বাধীনতা দাবিকরণের বৈধতা দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন, দৃষ্টান্তস্বরূপ – ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্যামেরুনের ধর্মপালদের

[২৭৮] খ্রীষ্টমণ্ডলী ও বিভিন্ন জাতির স্বাধীনতা

ক্যামেরুনের ধর্মপালগণ মানুষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার বৈধতাকে স্বীকৃতিদান করেন। তবে তাঁরা মার্কস্‌বাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত দলগুলোর ব্যাপারে সতর্ক ক'রে দিলেন।

"খ্রীষ্টমণ্ডলী ক্যামেরুনের জনগণের তাদের দেশের পরিচালনা নিজের হাতে নেওয়ার ও ইহাকে একটি স্বাধীন, সৎ ও সমৃদ্ধ জীবনের দিকে চালনা করার ইচ্ছাকে ন্যায্য ও উপযুক্ত তথ্য প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত বলেই মাত্র স্বীকৃতি দিতে পারে। ইহা অবশ্যই তাদের উৎসাহিত করবে যদি সুসমাচারের সুমহান বিধান – সত্য, ন্যায্যতা, বিচক্ষণতা ও প্রেম – মেনে চলা হয়। যে সকল দল তাদের পরিচালনা করে ব'লে দাবি করে থাকে, তাদের তর্কাতীত চিহ্নগুলো খ্রীষ্টানদের পক্ষে সনাক্ত করা আবশ্যক। কোন কোন দল সত্য, প্রেম, ন্যায্যতা ও বিচক্ষণতার পরিপন্থী। কাথলিকদের অবশ্যই সেসব আন্দোলনের সেই নীতিমালা ও পদ্ধতিগুলোকে সনাক্ত করতে হবে যেগুলোর সঙ্গে চাইলে বা না চাইলে এখনই মুখোমুখি হওয়া অনিবার্য।

আমরা যেন কিছুতেই প্রতারিত বা বিপথগামী না হই। মার্কস্‌বাদ হচ্ছে আমাদের সভ্যতায় চলতি বিপদ যদি না তা এর নীতিগুলো এখন বর্জন করে ও যে নামেরও আর উপযুক্ত নয়।"

ক্যামেরুনের ধর্মপালবৃন্দের যুক্ত পত্র, ১০ই এপ্রিল ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দ।

[২৭৯] ধর্মপালগণ জগতের মঙ্গলবার্তা প্রচারের জন্য সম্মিলিতভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত

"খ্রীষ্ট ও তাঁর প্রতিনিধির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত থেকে আমার সম্মানিত ভ্রাতৃগণ (ধর্মপালগণ), এক প্রাণবন্ত প্রেমের মনোভাব নিয়ে আমাদের স্কন্ধে ন্যস্ত প্রতিটি মণ্ডলীর জন্য সেই দুশ্চিন্তা নিয়েই (২ করিন্থীয় ১১:২৮) আপনারা আপনাদের ভূমিকা পালন করতে চাইবেন। খ্রীষ্টের ভালবাসা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে (২ করিন্থীয় ৫:১৪) আপনারা আমাদের সঙ্গে মঙ্গলবার্তা প্রচারের ও সমগ্র জগতে খ্রীষ্টমণ্ডলী প্রতিষ্ঠার জরুরী কর্তব্য গভীরভাবে উপলব্ধি করতে চাইবেন. . .

নিঃসন্দেহে অন্য আর এক ধরনের অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য সাহায্য সমর্থন অনেক ধর্মপাল দিয়ে থাকেন যারা কিছুটা ত্যাগস্বীকার করেও তাঁদের কিছু সংখ্যক যাজককে অনুমতি প্রদান করেন যেন তারা একটা সীমিত সময়ের জন্য আফ্রিকার ধর্মপালদের হস্তে নিজেদের সমর্পণ করতে পারেন। এটা ক'রে তারা তাদের এমন এক উপকার করেন, যা অন্য কিছু দিয়ে হবার নয়।"

পোপ দ্বাদশ পিউস, সার্বজনীনপত্র Fidei donum, ২১শে এপ্রিল, ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দ।

কথা এবং বেলজীয় কঙ্গোর ধর্মপালগণের কথা ও ১৯৫৬ সালে রুয়াণ্ডা বুরুণ্ডির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
[২৭৮] ইউরোপীয় উপনিবেশিকরা তাদেরকে মণ্ডলীর স্বার্থ রক্ষা করতে সচেষ্ট থেকে সুবিধাবাদী হওয়ার ও তাদের মাতৃভূমির বিরুদ্ধে কাজ করার দায়ে অভিযুক্ত করেন।

দেশীয় ধর্মপালগণ ক্রমশঃ ইউরোপীয় ধর্মপালদের স্থান দখল করছিলেন। প্রৈরিতিক প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সরাসরি রোমের উপর নির্ভরশীল প্রেরণকার্যাধীন এলাকাগুলো ধর্মপ্রদেশে পরিণত হয় পুরাতন ইউরোপীয় মণ্ডলীসমূহের ধর্মপ্রদেশরূপে । ঔপনিবেশিকতা মোচন সত্যিকার অর্থেই স্বায়ত্বশাসিত নতুন নতুন মণ্ডলীর উৎপত্তি ঘটায়। এখানে উল্লেখযোগ্য এই স্বায়ত্বশাসন সাগরের ওপারের প্রটেস্টান্ট মণ্ডলীগুলোতে অনেক আগেই শুরু হয়েছিল। প্রটেস্টান্ট মণ্ডলীগুলো কাথলিক মণ্ডলীর চেয়ে অনেক কম ইউরোপকেন্দ্রিক ।

[২৭৯] সার্বজনীন পত্র *Fidei Donum* (১৯৫৭)-এ পোপ দ্বাদশ পিউস এই মর্মে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেন যে, মঙ্গলবাণী প্রচারকার্য শুধুমাত্র বিশিষ্ট ব্যক্তির এখতিয়ার নয়, বরং সকল ধর্মপালেরই এ ব্যাপারে দায়িত্ব রয়ে গেছে। তাঁরা তাঁদের ধর্মপ্রদেশের কিছু সংখ্যক যাজকদের নবীন মণ্ডলীগুলোকে সাময়িক সহায়তাকল্পে প্রেরণ ক'রে এই দায়িত্ব বাস্তব ক'রে তুলতে পারেন পুরোহিতগণই।

কাথলিকগণ সচরাচর তাদের সময়কার দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত ক'রে থাকেন। কিন্তু মনে হয় বিভিন্ন মণ্ডলীর নেতৃবৃন্দ ও খ্রীষ্টীয় সংগঠনগুলো কর্তৃক গৃহীত অবস্থান এবং – সংগ্রামী বিশ্বাসীদের প্রচেষ্টা – খ্রীষ্টান ও জাতীয় মনোভাবকে উপনিবেশগুলোর স্বাধীনতার ব্যাপারটি গ্রহণ করতে সহায়তা করেছে।

॥৩ ॥ পালকীয় ও ঐশতাত্ত্বিক গতিশীলতা

১। ঐশতত্ত্ব ও খ্রীষ্টীয় ঐক্য-প্রচেষ্টা

কাথলিকদের দ্বারা বাইবেল পুনরাবিষ্কার

সার্বজনীন পত্র Divino afflante Spiritu (১৯৪৩)-এর মাধ্যমে কাথলিকদেরকে পবিত্র শাস্ত্র অধ্যয়নের অধিকতর স্বাধীনতা প্রদান করা হয়। বাইবেলের বিভিন্ন অনুবাদ থেকে বুঝতে পারা যায় কাথলিক মহলে কী পরিমাণ বাইবেলকে নতুন আলোয় জানার ও বুঝার সত্যিকার আগ্রহ দেখা দিয়েছিল। অনুবাদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অনুবাদ ছিল জেরুসালেম বাইবেল। পবিত্র শাস্ত্রকে ঐশতাত্ত্বিক অভিমত সমর্থনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উদ্ধৃতির মূলসূত্র হিসাবেই শুধু নয়, নিছক ঈশ্বরের বাণীরূপেই পবিত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন শুরু হয়।ফ্রান্সে ঐশবাণী পাঠ সংকলন কাথলিক বাইবেল ভাষ্যকারদের রচনাগুলো সন্নিবেশিত করে। বিভিন্ন সংকলনে বহু ঐতিহাসিক রচনা প্রমাণ করে যে, ঐশতত্ত্ব চিরন্তন বা কালাতীত নয়। পর্যালোচনাধর্মী সংস্করণ ও অনুবাদে উপাসনার ও মণ্ডলীর পিতৃগণের বহু মূল নথিপত্র প্রকাশিত হয় ।

খ্রীষ্টতত্ত্ব ও মণ্ডলীতত্ত্ব

খ্রীষ্টতত্ত্ব ও মণ্ডলীতত্ত্ব – উভয় দিক দিয়েই ঐশতত্ত্ব একটা নবায়নের অভিজ্ঞতা লাভ করে। যেজুইট পিয়ের তেইলার্দ দ্য শার্দেঁ (১৮৮১-১৯৫৫)-এর জীবদ্দশায় তাঁর কোন সরকারী বা আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি ছিল না এবং তাঁর কোন কিছু প্রকাশেরও অনুমতি ছিল না। গোপনে প্রচারিত তাঁর লেখা 'মানব প্রপঞ্চ' পুস্তকটি তাঁর মৃত্যুর পর

কুমরানে খননকার্য

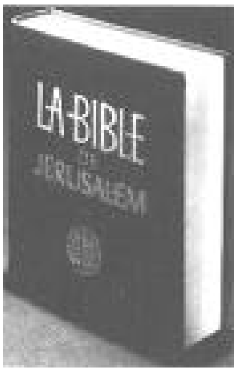

১৯৩১ খ্রীঃ 'অভিযান-আতংক'-এর সময় তেইলার্দ দ্য শার্দিন

প্রকাশিত হলে সর্বাধিক বিক্রিত পুস্তকে পরিণত হয়। তাঁর অনুকরণে মানুষ সর্ব খ্রীষ্টবাদ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডিক মরমীবাদ বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডিক খ্রীষ্টকেন্দ্রিকতা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেছে। সর্বভূতে একটি আত্মিক শক্তি রয়েছে যার অন্তরালে খ্রীষ্ট নিজেকে প্রকাশ করেন। মহাজগত ওমেগা কেন্দ্র অর্থাৎ খ্রীষ্টের পুনরাবির্ভাব অভিমুখে ধাবিত হচ্ছে। অন্যান্য লেখকগণও খ্রীষ্টীয় জীবনের খ্রীষ্টে কেন্দ্রায়নের সাক্ষ্য দান করেন।

দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে শুরু হওয়া মণ্ডলীতত্ত্বের ক্রমবিকাশ অব্যাহত থাকে। কঙ্গার, দ্য লুবাক ও অন্যান্য অনেক ফরাসী ঐশতত্ত্ববিদ মণ্ডলী বিষয়ক ঐশতত্ত্বকে ইতিহাসের প্রবাহে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন। এ ছাড়াও তাঁরা খ্রীষ্টমণ্ডলীকে যতটা না এমন কোন নিখুঁত সমাজরূপে উপস্থাপনের চেষ্টা করেন যার বিস্তারিত কাঠামোর ঘটনাটিও খ্রীষ্ট নিজে আগেই নির্দিষ্ট ক'রে গিয়েছিলেন, তার চেয়ে বেশী ঐশ অনুগ্রহের নিগূঢ়

[২৮০] তেইলার্দ দ্য শার্দেঁর সর্ব-খ্রীষ্টবাদ

তেইলার্দ দ্য শার্দেঁর (১৮৮১-১৯৫৫) রচনাবলী দীর্ঘকাল ধরে গোপনে গোপনে প্রচারিত হয়। তাঁর মৃত্যুর পরই মাত্র সেগুলো প্রকাশিত হয়।

"সর্বভূতের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে এক স্মৃতি ও কর্মের আগমন শুরু হয় যার প্রক্রিয়ায় অদৃষ্টবাদের শক্তি আজ্ঞানুবর্তী ও প্রেমময়তার সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত ও চালিত করে একটি ফল প্রস্তুতিতে, যা সকল আশার অতীত হলেও এখনও প্রত্যাশিত। জগতের যত শক্তি ও পদার্থসমূহ – এত সুসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে অভিযোজিত ও সুনিয়ন্ত্রিত যে, ব্রহ্মাণ্ডের অতীত পরম সত্তা বোধ হয় তাদের সর্বব্যাপিতা থেকে সম্পূর্ণরূপে অঙ্কুরিত হবেন – জেসের বংশে কেন্দ্রীভূত ও পরিশুদ্ধ হয়েছিল; তাদের সঞ্চিত ও শোধিত ধন থেকে তারা উৎপন্ন করল পদার্থের উজ্জ্বল রত্ন, মহাজগতের মুক্তা এবং দেহধারী ব্যক্তিক পরম সত্তার সঙ্গে সংযোগের মাধ্যমকে সাধন অর্থাৎ সর্বভূতের রাণী ও জননী, প্রকৃত (Demeter) ধন্যা কুমারী মারীয়াকে .. আর যখন কুমারীর দিন এসে পড়ল, তখন সুগভীর ও অযাচিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হঠাৎ ক'রে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল ঃ যেদিন থেকে ব্যক্তিতায়নের আদি প্রাণবায়ু মর্তে পরম কেন্দ্রের বিস্তৃত অঞ্চলের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল যাতে এর মধ্যে দেখতে পাওয়া যেতে পারে আদি সত্তার চূড়ান্ত এককের হাসির লহরী, সেদিন সমস্তই কিছুই সেই নারীর সেই গর্ভজাত সন্তানটির লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছিল।

আর যেহেতু খ্রীষ্ট জন্মগ্রহণ করলেন এবং বৃদ্ধি ক্ষান্ত হলে মৃত্যুবরণ করলেন, তখন সব কিছুর গতি অব্যাহত থাকল, কারণ তিনি যে এখনও তাঁর পূর্ণতা লাভ করেননি।"

পিয়ের তেইলার্দ দ্য শার্দেঁ, 'মানব পরকাল', ফাউন্ট পেপারব্যাকস্ ১৯৮২, ৩১৯-২০

রহস্য ও স্থানরূপে তুলে ধরার চেষ্টা করেন যেখানে খ্রীষ্টের দেখা মিলে।

এই যে মূল দলিলপত্রে ফিরে যাওয়া ও ইতিহাসের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা, এটা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টানদের একসঙ্গে হওয়ার পথ প্রশস্ত করে।

ঐক্য-প্রচেষ্টার অগ্রগতি

যুদ্ধের সহভাগিতাকৃত দুঃখ-ক্লেশ পরস্পরের সম্মুখীন হওয়ার সুযোগ ক'রে দেয়। বিভিন্ন সংস্থা খ্রীষ্টানদেরকে শরণার্থী ও ইহুদীদের সেবায় ঐক্যবদ্ধ করে। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে আমস্টার্ডামে মণ্ডলীসমূহের বিশ্ব পরিষদ স্থাপিত হয়। এই পরিষদ ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন ঐক্যপ্রয়াসী আন্দোলনকে, যথা – বিশ্বাস ও শৃঙ্খলা, জীবন ও কর্ম, আন্তর্জাতিক মিশনারী পরিষদকে একীভূত করে। অবশ্য এদের প্রত্যেকেই কিন্তু নিজস্ব সভা-বৈঠক অব্যাহত রাখে। যে কোন মণ্ডলীই প্রভু ও ত্রাণকর্তারূপে যীশু খ্রীষ্টে একটি বিশ্বাসের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে বিশ্ব পরিষদে যোগ দিতে পারত। বিশ্ব পরিষদ কোন অত্যুৎকৃষ্ট মণ্ডলী নয়, বরং একটা ফোরাম ও শ্রবণকারী স্থান, একটি প্রত্যাশী সমাজ ছিল। নিয়মিত বিরতিতে কোন সুনির্দিষ্ট বিষয়ের উপর পরিষদ কয়েকটি সাধারণ অধিবেশনের আয়োজন করে, যেমন – ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ইভানস্টোনে, ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে নতুন দিল্লীতে, ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে নাইরোবিতে, ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ভ্যাংকুবারে।

কাথলিকরা ঐক্য-প্রচেষ্টার ব্যাপারে অনিচ্ছা প্রদর্শন অব্যাহত রাখে। ঐক্যবাদ-এর অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন ভ্রাতৃগণের বা ভিন্নমতাবলম্বীদের সত্য মণ্ডলীতে অর্থাৎ রোমের মণ্ডলীতে ফিরে আসার সমর্থকদের মধ্যে একটা টানাপোড়েন সব সময়ই রয়েছে। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে মণ্ডলীসমূহের বিশ্ব পরিষদ গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে রোম শুধু এতে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকৃতিই জানায়নি, সেইসঙ্গে ধর্মীয় কারণে (কাথলিক ও অ-কাথলিকদের মধ্যে) মিশ্র বিবাহ এবং অন্য সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টপ্রসাদীয় অনুষ্ঠানে কাথলিকদের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করে (১৯৪৮)। তবে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে পুণ্য দপ্তর ঐক্য-আন্দোলনকে 'উল্লেখযোগ্য কার্য' ও পবিত্র আত্মার ফলরূপে স্বীকৃতি দেয়। ধর্মপালদেরকে আন্তঃসাম্প্রদায়িক বৈঠকে অংশগ্রহণ করার অধিকার প্রদান করা হয়। অ-কাথলিকদের সঙ্গে কাথলিকদের 'হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ' প্রার্থনাটি বলার অনুমতি দেওয়া হয়। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুবরণকারী ফাঃ কুতুরিয়ে তার জীবনের শেষ বছরগুলোতে আত্মিক ঐক্য-প্রচেষ্টা পূর্ণতর করেন যাকে তিনি 'অদৃশ্য সন্ন্যাস ধর্ম' ব'লে অভিহিত করেন।

২। টানাপোড়েন ও সংকট

পোপ দ্বাদশ পিউসের পোপীয় কার্যকালের শেষ বছরগুলোতে কতগুলো পর্যায়ক্রমিক টানাপোড়েন ও সংকট দেখা দেয় যেগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ছিল। এগুলো কিছুটা ভুল বোঝাবুঝি ও আশঙ্কার ফল ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে তা যে কয়েকটি ক্ষেত্রে শেষ সীমায় ও অনিবার্য অসুবিধার মধ্যে গিয়ে পৌঁছেছে, এটা তার একটি ইঙ্গিতও ছিল।

ঐশতত্ত্ব

আগষ্ট ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে পোপ দ্বাদশ পিউস Humani Generis নামক সার্বজনীন পত্র প্রকাশ করেন। এটি ছিল 'কয়েকটি ভ্রান্ত ধারণা বিষয়ক, যেগুলো কাথলিক শিক্ষার ভিত্তি দুর্বল ক'রে ফেলার আশঙ্কা সৃষ্টি করে'। যাকে সময় সময় বলা হয়েছে 'নতুন ঐশতত্ত্ব', সমসাময়িক মানব জাতির উপর ঐশতাত্ত্বিক চিন্তন যা ইতিহাসকে খুবই গুরুত্ব দেয়, তাকে পোপ চ্যালেঞ্জ করেন। দর্শন ও ঐশতত্ত্বের ক্ষেত্রে তিনি সাধু টমাসের সাধারণ্যে গৃহীত বা অনুমোদিত অভিমত অবলম্বন করার আহ্বান জানান। বিভিন্ন মণ্ডলীর খ্রীষ্টানদের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে সার্বজনীন পত্রটি "বিপজ্জনক শান্তিপ্রিয়তা" সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করে, যা একতার খাতিরে সত্যের খাঁটিত্বে কম গুরুত্ব দেয়। এতে কারও নাম উল্লেখ করা হয়নি, ভুল-ভ্রান্তির তালিকাও দেওয়া হয়নি, কিন্তু খোলসের নীচে নিন্দিত ঐশতাত্ত্বিক ধারা ও ঐশতত্ত্ববিদদের চিহ্নিত করা কঠিন কিছু ছিল না।

সৃষ্টি ও আদি পাপ বিষয়ক তত্ত্বের সঙ্গে ও বহু বংশবাদের (মানব জাতির সূচনায় কয়েকজন মানুষের অস্তিত্ব ছিল বলে মতবাদ) সঙ্গে সঙ্গতিহীনতার জন্য তেইলার্দ দ্য শার্দেঁ -কে সমালোচনার নিশানা করা হয়। প্রকৃতি ও অতিপ্রকৃতি, ইতিহাস ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক বিতর্কের জন্য যেজুইট ঐশতত্ত্ববিদদের সমালোচনা করা হয় যারা কিনা

সার্বজনীন পত্রটির ধাক্কা সামলিয়েছিলেন ঃ তাদের কাউকে কাউকে শিক্ষকতা বাদ দিতে ও কোন কিছু প্রকাশ না করার ওয়াদা করতে হয়েছিল।

১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রমজীবী যাজকদের ব্যাপারটির সময় ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ডমিনিকীয় কঙ্গার ও চেনউ-র ন্যায় ঐশতত্ত্ববিদদের শিক্ষকতা নিষিদ্ধ করা হয়।

১লা নভেম্বর, ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন তত্ত্বের ঘোষণা অধিকাংশ কাথলিকদের মধ্যে আনন্দের জোয়ার বহায় বটে কিন্তু প্রটেস্টান্ট ও অর্থডক্সদের মধ্যে খ্রীষ্টীয় ঐক্যকর্মী মহলে অস্বস্তি সৃষ্টি করে।

শ্রমজীবী যাজকদের ব্যাপার

ফ্রান্সে গরীবদের কাছে মঙ্গলবার্তা প্রচারের চিন্তা এই সত্যটি উপেক্ষা করতে পারেনি যে, শ্রমিক শ্রেণীর একটি বিরাট অংশই কম্যুনিষ্ট আন্দোলন, শ্রমিক সংঘ ও কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। কাথলিকরা ভেবেছিল তাদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে তারা কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে কাজ করতে পারবে ও প্রগতিশীল খ্রীষ্টানদের একটি সংঘ গঠন করতে সক্ষম হবে। শ্রমজীবী যাজকগণ শ্রমিক আন্দোলনগুলোতে যোগ দেন। কিন্তু ভাটিকানের পুণ্য দপ্তর কম্যুনিষ্টদের

[২৮১] একজন শ্রমজীবী যাজকের জীবনযাত্রা

মিশন দ্য প্যারিসের কয়েকজন শ্রমজীবী যাজক অক্টোবর, ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসের নতুন মহাধর্মপাল মঙ্গিনিয়র ফেল্‌ত্যাঁ-এর জন্য তাদের জীবনযাত্রার স্মৃতি রোমন্থন করেন। নীচে একজন যাজকের জীবন-সাক্ষ্য থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত হয়েছে যিনি একটি ঢালাইখানার একজন ঢালাইকার হয়ে শ্রমিক-যাজকের জীবন শুরু করেছিলেন।

"আমি যখন কম্পতেয়ুর দ্য মনক্রজ-এ এসে পৌঁছি, তখন আমি আমার পিছনে বার বছরের নিরবচ্ছিন্ন সেমিনারীর জীবন ফেলে আসি। আমি শ্রমজীবী শ্রেণীর কাছে এমন কিছু নিয়ে এলাম যা আমি অপরিহার্য মনে করলাম ঃ বিদ্যা, একটা সুষম ব্যক্তিত্ব, উৎসাহ-উদ্দীপনা... ইত্যাদি।

আমি ব্যক্তিগত প্রভাবে বিশ্বাস করতাম। আমি ব্যক্তি-যোগাযোগকে মূল্য দিতাম। আমি আলাপ আলোচনা ভালবাসতাম। আমি আশা করেছিলাম আমার জ্ঞান মানুষের মনের উপর গভীর ছাপ ফেলবে, লোকদের কাছে ঈশ্বরকে উপস্থিত করতে চেয়েছিলাম। আর বিশেষ ক'রে জীবন যাপন ও কাজ করতাম এ দু'টি আলাদা রেখে ঃ ঈশ্বরে আমার বিশ্বাস এবং সেই জগত যেখানে মণ্ডলী আমাকে প্রেরণ করেছিল। এই জগৎ সম্পর্কে আমার কিছুই জানা ছিল না।

কম্পতেয়ুর দ্য মনক্রজ-এ আমার দু'মাসের ব্যাপ্তিকাল আমার মোহমুক্তি ঘটায়। কারখানা ত্যাগ করে প্যারিসের ক্রেমল্যাঁ – বিসত্রে ও জাঁটি জেলাদ্বয়ে নিজেকে আরও বেশী সহজলভ্য ক'রে তোলার জন্য আমি এই মর্মে দৃঢ় প্রত্যয় অব্যাহত রাখি যে, আমাকে আমার বিদ্যা, আমার মন-মানসিকতা, আমার মনোভঙ্গি সবই বিসর্জন দিতে হবে যাতে আমি নিজেকে শ্রমজীবী শ্রেণীর কাজ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে দিতে পারি।

আমি মায়েদের নিত্যদিনকার সমস্যার কথা অবহিত হলাম ঃ আমি এমন বাড়ীর দেখা পেলাম, যেখানে ছোট্ট দু'টি ঘরে দশজন লোক গাদাগাদি ক'রে থাকে। সবচেয়ে বড় কথা, শ্রমজীবী শ্রেণী পরিবারগুলোর উপর চাপিয়ে দেওয়া এসব অমানবিক অবস্থার বিরুদ্ধে তাদের পক্ষ থেকে একটা সুপ্ত কিন্তু বাস্তব কম-বেশী সচেতন বিদ্রোহ আবিষ্কার করলাম। কাজেই আমাকে যে দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছে তার মধ্যে নিজের একটি মাত্র অবস্থানই নির্ণয় করা সম্ভব ছিল ঃ আমার যাজকত্বকে হতে হবে তাদেরই যাজকত্ব, অন্যথায় ওটা কোন যাজকত্বই থাকবে না।

যে লোকেরা আমাকে ঘিরে থাকত, রাস্তাঘাটে যাদের সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হত, যাদের সঙ্গে আমি মালবাহী ট্রাকের মাল খালাস করতাম, যাদের জীবন ও কর্মের আমি সহভাগী হয়েছিলাম সেই বাজারে, যেখানে আমি দু'বছর একজন ফিটার-মিস্ত্রি ছিলাম, তারা আমার কাছ থেকে কোন পরামর্শ বা সেবা আশা করত না। তারা শুধু একটি বিষয়েই সচেতন ছিল ঃ আমাদের সবার জীবন অভিন্ন, আমাদের সকলের অদৃষ্টই এক।"

In Les Prêtres - Ouvriers, Editions de Minuit ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত।

[২৮১] সঙ্গে সর্বপ্রকার সহযোগিতা নিষিদ্ধ ক'রে দেয়। এতে শ্রমজীবী যাজকদের জীবনধারা ও কর্মকাণ্ডের বিষয়ে রোমে খুব শিগ্‌গিরই উদ্বেগ দেখা দেয়। পোপ মহোদয় ভেবেছিলেন শ্রমজীবী যাজকগণ আর আধ্যাত্মিক মানুষ নয়, কাজেই ভক্তসাধারণরূপে তার বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ভূমিকা সন্দেহযুক্ত। শ্রমজীবী যাজক নিজেকে সাধারণ ভক্তে পরিণত করছিলেন , আর তাই পোপ দ্বাদশ পিউস যাজকত্বের বিশুদ্ধতা অক্ষুণ্ন রাখতে চেয়েছিলেন।

ফরাসী কার্ডিনালদের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ১লা মার্চ, ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রমজীবী যাজকদেরকে পূর্ণকালীন কারখানার কাজ বাদ দিতে হয়। একশ' জনের মত শ্রমজীবী যাজকের মধ্যে প্রায় অর্ধেক উক্ত নির্দেশের বশবর্তী হয়। অন্যেরা কিন্তু তাদের আগের মতই চলতে থাকে, কারণ তারা শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে নিজেদেরকে সম্পর্ক-বন্ধনে আবদ্ধ করেছে যে ক্ষেত্রে মণ্ডলীকে অনাগ্রহী বলে তাদের মনে হয়েছে। ব্যাপারটি গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

মিশন দ্য ফ্রান্স সেমিনারীকে ঢেলে সাজানো ও মিশন ওভ্রিয়ের-এর স্থাপন, পালকীয় কাজের সমন্বয়ন সাধন (যাজক ও কাথলিক কর্মোদ্যোগ আন্দোলনের মধ্য) থেকে এই ইঙ্গিত মিলে যে, ফ্রান্সের মণ্ডলী তার আদি পরিপ্রেক্ষিত বিসর্জন দেয়নি।

শুধু ফ্রান্সে নয়, অন্য ধরনের সংকটও ছিল; বিশেষ ক'রে ধর্মশিক্ষার বিষয়ে। বিভিন্ন উদ্যোগে সমৃদ্ধ একটি পোপীয় কার্যকালের শেষ দিকে কয়েকটি নাজুক অবস্থার উদ্ভব হয়।

এক নতুন পোপের কার্যকাল ও মহাসভার ঘোষণা এ সমস্ত যুদ্ধোত্তর উদ্যোগগুলো সফলতার মুখ দেখার সুযোগ পায়।